Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণের ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মির্জানা আফরিন

রোলঃ 216022349

২৬ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণের ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মির্জানা আফরিন

রোলঃ 216022349

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণের ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মির্জানা আফরিন, আইডিঃ 216022349 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণের ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মির্জানা আফরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৬ মে, ২০২৪ ইং

মির্জানা আফরিন

আইডিঃ 216022349

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 6

ধৈর্য্য কি: 8

ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত 10

ধৈর্যের প্রকারভেদ 11

ধৈর্যের স্তরসমূহ 14

সম্মানিত ব্যক্তির ধৈর্য এবং হীন ব্যক্তির ধৈর্য 15

কখন ধৈর্যের প্রয়োজন দেখা দেয়? 16

আল্লাহর ইবাদাতে ধৈর্য: 17

পাপকাজ পরিহারে ধৈর্য: 17

পরীক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য: 18

সুখের চেয়ে দুঃখের সময় ধৈর্য্য ধারণ সহজ: 19

সর্বাধিক কষ্টসাধ্য ধৈর্য্য: 21

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য: 22

বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণ: 23

বালা-মুসিবত ; ইমানের পরীক্ষা :- 25

ইমানদার ব্যাক্তির পুরস্কারস্বরূপ;বালা-মুসিবত: 27

বিপদ যখন নিয়ামাত 28

বিপদ কামনা করা অনুচিত 31

বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় 32

মানবজীবনে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা: 39

আল-কুরআনের নির্দেশনায় বালা-মুসিবত ও ধৈর্য :- 41

ধৈর্য সম্পর্কে সুন্নাহার ভাষ্য:- 43

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা : ফযীলত ও পদ্ধতি 48

রেফারেন্স: 50

ভূমিকা:

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই এর মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদি যুগ থেকে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ সা:কে পাঠিয়েছেন মানবতার উৎকর্ষের পূর্ণতা দেয়ার জন্য। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: বলেন, 'বুইছতু লিউতাম্মিমা মাকারিমাল আখলাক' অর্থাৎ- 'আমাকে পাঠানো হয়েছে সুন্দর চরিত্রের পূর্ণতা দেয়ার জন্য।(মুসলিম ও তিরমিজি)

মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। পবিত্র কুরআনে স্থানে স্থানে মহান আল্লাহ নিজেকে ধৈর্যশীল হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ধৈর্য উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ও মুমিনের ভূষণ এবং সফলতার মূল চাবিকাঠি। ধৈর্য মনুষ্যত্বের অন্যতম পরিচায়ক। আরবিতে এর প্রতিশব্দ সবর। যার অর্থ- সংযম অবলম্বন করা, নফসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করা।

একজন মুমিন জীবনের সব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন আর এটিই ইসলামের শিক্ষা। ঈমানদারদের সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা করো।' (সূরা আলে ইমরান-২০০) অন্যত্র বলেন, 'ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে'।(সূরা জুমার-১০)

ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজিদে বলেছেন, 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (সূরা আসর : ১-৩)। এই সূরার শেষে আল্লাহ ধৈর্যকে সাফল্যের নিয়ামকরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সঙ্কল্পের কাজ।' (সূরা শুরা-৪৩)

আলিমগণের ঐকমত্যে ধৈর্য বা ধৈর্যের অধ্যবসায় বাধ্যতামূলক। এটা ঈমানের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক কৃতজ্ঞতা। কুরআনুল কারীমে মোট নব্বই বার ধৈর্যের উল্লেখ আছে। ঈমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক-দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো; আর যার ধৈর্য নেই তার ঈমানও নেই।

নিচের আয়াতগুলোতে আল্লাহ মুমিন বান্দাদের ধৈর্যধারণের আদেশ দিয়েছেন:

* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। "

জান্নাতে প্রবেশের জন্য এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্যকে শর্ত বানানো হয়েছে। হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন:

(إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

"নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদের পুরস্কৃত করলাম, আজ তারাই হলো সফলকাম। "

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের তাগিদ দিয়ে বলেন:

" (وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।"[১]

" (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। "

আল্লাহ আমাদের বলেন-তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এই 'সাথে থাকা' বিশেষ ধরনের সাহচর্যকে বোঝায়। এখানে সাথে থাকার অর্থ: আল্লাহ তাদের বিপদে রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন। সাধারণ সাহচর্যের অর্থ: আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে দেখেন এবং তাদের সম্পর্কে জানেন; এখানে মুমিন ও কাফির সকলেই সমান।

আল্লাহ বলেন:

(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া কোরো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।
নবিজি বলেন, ধৈর্য হচ্ছে সবচেয়ে ভালো (গুণ) এবং সকল ভালোর সমাহার।
তিনি আরও বলেন, "ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো উপহার নেই।" উমার ইবনুল আর তোমরা ধৈর্য ধরো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

নবিজি বলেন, ধৈর্য হচ্ছে সবচেয়ে ভালো (গুণ) এবং সকল ভালোর সমাহার। তিনি আরও বলেন, "ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো উপহার নেই।" উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন, "আমাদের সুন্দর দিনগুলো ধৈর্যের গুণে পরিপূর্ণ ছিল।"
আর বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণের উত্তম সময়। তাই আমাদের উচিত বালা মুসিবতে দিশেহারা না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করা।

ধৈর্য্য কি:

ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ 'সবর'। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা, আটক থাকা ইত্যাদি। আরবিতে একটা অভিব্যক্তি আছে: "অমুক সবরান (আটক অবস্থায়) নিহত হয়েছে।" এর মানে সে বন্দী হয়েছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করেছে। আত্মিকভাবে 'সবর' বলতে বোঝায় নিজেকে দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে সংযত রাখা, দুর্দশা ও চাপের সময় কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ও কপাল চাপড়ানো থেকে বিরত থাকা।

একজন আলিম বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার বিপরীতে বোধশক্তি ও দ্বীনের প্রেরণার ওপর অটল থাকা।" মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনার প্রতি ঝোঁক থাকাটা খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। কিন্তু সহজাত বিবেচনাশক্তি ও ধর্মীয় প্রেরণার মাধ্যমে এই ঝোঁকের লাগাম টেনে ধরা উচিত। এই দুই পরাশক্তি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে-কখনো বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জয়ী হয় আবার কখনো প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা বিজয়ী হয়। এই মারাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের মন।

পরিস্থিতি অনুযায়ী ধৈর্যের বিভিন্ন নাম রয়েছে:

• আপনার ধৈর্য যদি যৌনকামনা রোধ করে, তবে একে বলে পবিত্রতা। এর বিপরীত হচ্ছে অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও লাম্পট্য।

• ধৈর্য যদি আপনাকে পেটের অবৈধ কামনা ও খাবারের জন্য তাড়াহুড়ো করা কিংবা বাজে খাবার গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, তবে তার নাম 'অভিজাত নফস'। এর বিপরীত হলো লালসা, হীনতা ও নিকৃষ্টতা।

. 'প্রকাশ করা ঠিক নয়' এমন কিছু প্রকাশ না করে চুপ থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে এটাকে বলে গোপনীয়তা। এর বিপরীত হলো জনসম্মুখে প্রচার করা, গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া, মিথ্যা অপবাদ, কদর্যতা, গালিগালাজ, মিথ্যা ও দুর্নামকরণ।

• যদি জীবনযাপনে অতিরিক্ত খরচ না করে ধৈর্য ধরা হয়, তবে একে আত্মসংযম বলা হয়। লোভ হচ্ছে এর বিপরীত।

• যদি দুনিয়ায় অল্পে তুষ্ট হন, তাহলে একে বলা হবে অল্পেতুষ্টি। এর বিপরীতও লোভ।

• ধৈর্য যদি আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়, তবে একে বলে সহিষ্ণুতা। হঠকারিতা এবং ত্বরিত প্রতিক্রিয়াশীলতা এর বিপরীত।

• আপনার ধৈর্য যদি আপনাকে ত্বরাপ্রবণতা থেকে বিরত রাখে, তবে একে বসে গাম্ভীর্য, স্থিরতা। এর বিপরীত হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা ও চপলতা।

• ধৈর্য যদি আপনাকে পালিয়ে যাওয়ার ও ছিটকে পড়ার কাপুরুষোচিত স্বভাব থেকে বিরত রাখে, তবে একে বলে সাহসিকতা। যার বিপরীত হচ্ছে কাপুরুষতা ও মাথানত করা।

• ধৈর্য যদি আপনাকে প্রতিশোধ প্রবণতা থেকে রক্ষা করে; তবে এটাকে বলা হয় ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা। যার বিপরীত হচ্ছে প্রতিশোধ ও শাস্তিদান।

যদি ধৈর্য আপনাকে কৃপণ হওয়া থেকে বাধা দেয়, তবে তা বদান্যতা। এর বিপরীত হচ্ছে কৃপণতা।

• ধৈর্য যদি আপনাকে নির্ধারিত সময়ে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ হতে বিরত রাখে তবে এর নাম সাওম।

• যদি ধৈর্য আপনাকে অলসতা এবং অক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, তবে একে বলে বিচক্ষণতা।

• আর আপনার ধৈর্য যদি লোকদের দোষারোপ করা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে একে বলে পৌরুষ।

পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে এর (ধৈর্যের) নাম যা-ই হোক না কেন, এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য এক। এটা প্রমাণ করে, আমাদের ইসলামি জীবনের পূর্ণতা ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীল।

ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত

কতক আলিম ধৈর্যকে একটি উত্তম মানবিক গুণ অথবা নৈতিক মূল্যবোধ বলে অভিহিত করেছেন, যার সাহায্যে আমরা নিজেদের খারাপ কিছু থেকে বিরত রাখি। ধৈর্যবিনে মানুষ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে সক্ষম নয়।

আবূ উসমান বলেন, “(ধৈর্য হচ্ছে তা) যা ব্যক্তিকে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহের আক্রমণে অভ্যস্ত করে তোলে।" আমর ইবনু উসমান আল-মাক্কি বলেন, "ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিপদ- আপদ নিশ্চুপভাবে শান্তমনে গ্রহণ করা।" আল-খাওয়াস বলেন, "ধৈর্য বলতে কুরআন-সুন্নাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা বোঝায়।" আরেকজন আলিমের মতে: "কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই ধৈর্য।" আর আলি ইবনু আবী তালিব বলেন, “ধৈর্য হলো পশুর পিঠে আরোহণ করার মতো, যা থেকে তুমি ছিটকে পড়বে না।"

ধৈর্যের প্রকারভেদ

কাজ বা আচরণ অনুযায়ী ধৈর্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব)

২. পছন্দনীয় (মানদূব)

৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর)

৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ)

৫. অনুমোদিত (মুবাহ)

১. আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) ধৈর্য:

হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।

ওয়াজিব আমলগুলো আদায়ে ধৈর্য।

• এমন-সব মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করা, যা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয় যেমন: অসুস্থতা, দরিদ্রতা ইত্যাদি।

২. পছন্দনীয় (মানদূব) ধৈর্য:

• মাকরূহ কাজ থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।

মুস্তাহাব ইবাদাতগুলো করার ধৈর্য।

• প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে সংযত থাকার ধৈর্য।

৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর) ধৈর্য:

মৃত্যু পর্যন্ত পানাহার থেকে দূরে থাকার ধৈর্য।

• যখন মৃত জন্তু, রক্ত কিংবা শূকরের মাংস না খেলে মৃত্যু অবধারিত তখন তা না খেয়ে ধৈর্য ধরা। তাউস এ ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন, "যদি কেউ মৃত জন্তু ও রক্ত খেতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তা না খেয়ে মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।"

ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকার ধৈর্য। মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা কি হারাম নাকি মুবাহ তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এ-এর সাথীদের যাহির নস হচ্ছে, ভিক্ষা না করে এ রকম ধৈর্য ধরা জায়েয। [২] তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "যদি কেউ ভিক্ষা না করলে মৃত্যুর আশঙ্কা করে তাহলে?" ইমাম আহমাদ বলেন, "না, সে মারা যাবে না। আল্লাহ তার জন্য বরাদ্দকৃত রিযিক পাঠাবেন।"[২৯] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ভিক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেহেতু বান্দার চাহিদা এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকার নিষ্ঠা সম্পর্কে জানেন, তিনি অবশ্যই তার কাছে রিযিক পাঠাবেন। ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফিঈ এ-এর অধিকাংশ সাথীর মতে এমন ব্যক্তির ওপর ভিক্ষা করা ওয়াজিব, আর যদি সে ভিক্ষা না করে, তাহলে গুনাহগার হবে। কেননা, ভিক্ষার মাধ্যমে সে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

অপর একটি নিষিদ্ধ ধৈর্য হচ্ছে এমন-সব বিষয়ে ধৈর্য ধরা, যা মানুষকে ধ্বংস করে। যেমন: হিংস্র জন্তু, সাপ, আগুন, পানি কিংবা এমন কাফির থেকে আত্মরক্ষা না করা, যে তাকে হত্যা করতে চায়।

ফিতনার সময় ধৈর্যধারণ-যখন মুসলিমদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। মুসলিমদের মধ্যে যখন পরস্পর খুনোখুনি হয় তখন ধৈর্যধারণ করা অনুমোদিত (মুবাহ), একই সাথে মুস্তাহাবও (পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়)। নবিজি -কে যখন এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন: "আদামের দু-সন্তানের উত্তম জনের মতো হও।"

অনুরূপ আরেকটি বর্ণনায় নবিজি বলেন,

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل

“আল্লাহর (অন্যায়ভাবে) নিহত বান্দার মতো হও, তার মতো নয় যে (অন্যায়ভাবে) হতাকারী। "এবং دعه يبوء بإثمه وإثمك "তাকে (খুনি) নিজের এবং তোমার পাপের ভার বহন করতে দাও।" ।০০] অন্য একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك

"যদি তরবারির ঔজ্জ্বল্য তোমার চোখ ঝলসে দেয় তবে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নাও।" আল্লাহ কুরআনে আদাম এ-এর দুই সন্তানের উত্তম জনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে সে কীভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিল। কাফিরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধের ব্যাপারটা আলাদা। এ অবস্থায় মুসলিমদের জন্য আত্মরক্ষা ওয়াজিব; কারণ, জিহাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে এবং মুসলিমদের রক্ষা করা।

৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ) ধৈর্য:

খাদ্য, পানীয়, পোশাক এবং স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন থেকে এতটুকু বিরত থাকা, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।
স্ত্রীর প্রয়োজনের সময় যৌনমিলন না করা।

• মাকরূহ কাজ করার ধৈর্য।

মুস্তাহাব আমল না করার ধৈর্য।

৫. অনুমোদিত (মুবাহ) ধৈর্য:

অনুমোদিত (মুবাহ) এবং ইসলামে বাধ্যবাধকতা নেই এমন কাজ থেকে বিরত থাকার ধৈর্য।

ধৈর্যের স্তরসমূহ

ধৈর্য দু-ধরনের হতে পারে: হয় শারীরিক, না-হয় মানসিক। আর উভয় প্রকার ধৈর্য ঐচ্ছিক হতে পারে, অনৈচ্ছিকও হতে পারে। এগুলো মোট চার প্রকার:

১. ঐচ্ছিক শারীরিক ধৈর্য:

যেমন: স্বেচ্ছায় কঠোর পরিশ্রম করা।

২. অনৈচ্ছিক শারীরিক ধৈর্য:

যেমন: নিরুপায় অবস্থায় ধৈর্যের সাথে রোগ-শোক, গরম বা শীতের প্রকোপ সহ্য করা।

৩. ঐচ্ছিক মানসিক ধৈর্য:

যেমন: বিবেকের বিচার বা শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় দিক দিয়ে অন্যায়, এমন কিছু থেকে ধৈর্য-সহকারে বিরত থাকা।

৪. অনৈচ্ছিক মানসিক ধৈর্য:

যেমন: ভালোবাসার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতা মেনে নেওয়া।

ওপরে যেমন বলা হয়েছে ধৈর্য দু-ধরনের: ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক। ঐচ্ছিক ধৈর্যের মর্যাদা অনৈচ্ছিক ধৈর্যের চেয়ে উঁচু স্তরের। দ্বিতীয়টি সাধারণত সবার ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিন্তু প্রথমটি অর্জন করে নিতে হয়। এ কারণে আজীজের স্ত্রীর (গুনাহের প্ররোচনায় সাড়া না দিয়ে) অবাধ্য হওয়া এবং এর জন্য কারাভোগ করার সময় ইউসুফ এর যে ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন, তা তার ভাইদের অন্যায় আচরণের সময় তার প্রদর্শিত ধৈর্যের চেয়ে উঁচু স্তরের ছিল। ভাইয়েরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তাকে বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এবং তাঁকে বিক্রি করা হয়েছিল দাস হিসেবে-এ সবকিছুর পরও ইউসুফ এ তাদের সাথে সুব্যবহারে ধৈর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। এই উঁচু স্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ধৈর্য হচ্ছে ইবরাহীম,

মূসা, নূহ, ঈসা, সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ -এর ধৈর্য। নবি-রাসূলগণের এই ধৈর্য ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরন্তর জিহাদের পথে।

ওপরের চার ধরনের ধৈর্য কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে কেবল দু-ধরনের ধৈর্য দেখা যায়, যাতে তাদের ইচ্ছের কোনো দখল নেই। ধৈর্যধারণে ইচ্ছের স্বাধীনতা মানুষকে প্রাণীজগৎ থেকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এরপরেও অনেক মানুষের কেবল প্রাণীদের মতো ধৈর্যটুকুই রয়েছে, অর্থাৎ অনৈচ্ছিক ধৈর্য।

সম্মানিত ব্যক্তির ধৈর্য এবং হীন ব্যক্তির ধৈর্য

বিপদে পড়লে আমাদের সবাইকেই ধৈর্য ধরতে হয় হয়-কেউ স্বেচ্ছায় ধরি কেউ-বা নিরুপায় হয়ে। তবে যিনি মহান, তিনি স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণ করেন; কারণ, তিনি এর সুন্দর ফলাফল সম্বন্ধে জানেন এবং সে এটাও জানেন যে, ধৈর্যধারণ করলে তিনি প্রশংসিত হবেন আর উদ্বিগ্ন হলে নিন্দিত হবে। তিনি ভালো করেই বোঝেন যে, যদি তিনি ধৈর্যধারণ না করেন, তাহলে উদ্বেগ তাকে হারানো জিনিসটি ফিরিয়ে দেবে না, অপছন্দের কাঁটাও সরিয়ে নেবে না। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে তাকদির বদলে যাবে না আর তিনি চান বলে কোনো কিছু তাকদিরে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে না। সুতরাং উদ্বেগ বস্তুত ক্ষতির কারণ হয়।

কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছিলেন: মুসিবত নাযিল হওয়ার সময়ই জ্ঞানীরা যা করবার তা করে নেয়, আর আহাম্মকেরা সেটা করে এক মাস পর।

হীন ব্যক্তি কেবল উপায়ান্তর না পেয়ে ধৈর্যধারণ করে। উদ্বিগ্ন হয়ে সে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত একে মোকাবিলা করার কিছু খুঁজে না পেয়ে-পেটানোর জন্য বেঁধে রাখা ব্যক্তির মতো-সবর করে।

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করে। অপরদিকে হীন লোকেরা শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্য ধরে।

হীন লোকেরা নিজের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সর্বাধিক ধৈর্যশীল হয়ে থাকে কিন্তু তাদের রবের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সবচাইতে কম ধৈর্যশীল হয়।

নিজেদের প্রবৃত্তিপুজোয় বিভিন্ন রকম ঝুটঝামেলা পোহাতে তারা রাজি, কিন্তু প্রভুর সন্তুষ্টির স্বার্থে সামান্যতম কষ্ট স্বীকারে বেজায় নারাজ। এরা 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভয়ে সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ থেকে বিরত থাকে, কামনা-বাসনা চরিতার্থে গর্ববোধ করে এবং হাজারো অপমান সয়ে যায় নীরবে। একইভাবে তারা নিজেদের আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়ার জন্য ধৈর্যধারণ করে না, কিন্তু শয়তান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। এমন লোকেরা আল্লাহর চোখে কখনো মহৎ হতে পারে না এবং হাশরের ময়দানে সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের কাতারে ঠাঁই পাবে না।

কখন ধৈর্যের প্রয়োজন দেখা দেয়?

জীবনের যেসব ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন পড়ে:

১. আল্লাহর ইবাদাতে ও তাঁর বিধিবিধান অনুসরণে

২. পাপকাজ থেকে বিরত থাকতে

৩. আল্লাহর ফায়সালা ও ভাগ্য মেনে নিতে।

লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ....

"হে বৎস, তুমি নামায কায়িম করো, সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর মন্দ কাজ হতে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো।"[২০]

সৎকাজের আদেশদান মানে নিজেও সৎকর্মশীল হওয়া। অসৎকাজে বাধাদান মানে নিজেও তা থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যশীল হওয়া।

আল্লাহর ইবাদাতে ধৈর্য:

আল্লাহর ইবাদাত ও বিধিবিধানের অনুসরণ বলতে বোঝায় আপনি জেনেবুঝে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর নির্ধারিত ইবাদাতসমূহ নিয়মিত আদায় করবেন। যে ইবাদাত নিয়মিত করা হয় না, তার কোনো মূল্য নেই। এমনকি নিয়মিত আদায় করা হয় এমন ইবাদাতও দুটো আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়:

প্রথমত, যদি ইবাদাতের উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জন বা সন্তুষ্টি অর্জন না হয়, তাহলে আমরা ইখলাস হারাতে পারি। সুতরাং আমাদের ইবাদাত সুরক্ষার জন নিষ্ঠাবান হওয়া জরুরি।

দ্বিতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন রাসূল-এর দেখানো পথ থেকে সরে না যাই। আর সে জন্য সুন্নাহ অনুযায়ী ইবাদাত নিশ্চিত করতে হবে।

পাপকাজ পরিহারে ধৈর্য:

এ ধরনের ধৈর্য পাপের শাস্তির ভয়ের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। অথবা পাপকাজে আল্লাহর নিআমাতরাজির অপব্যবহারে লজ্জাবোধের উপলব্ধি থেকে থেকেও অর্জিত হতে পারে। আল্লাহর ব্যাপারে লজ্জাশীলতার এই উপলব্ধি শক্তিশালী হতে পারে তাঁর সম্পর্কে অধিক জানাশোনা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলির মর্ম অনুধাবনের মধ্য দিয়ে। হায়া বা লজ্জাশীলতা উন্নত চরিত্র ও সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে লজ্জাশীলতার কারণে খারাপ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে সে শাস্তির ভয়ে দূরে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। লজ্জাশীলতা প্রমাণ করে, ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। আর যার প্রতিবন্ধক হচ্ছে আল্লাহর ভয় তার নজর থাকে শাস্তির দিকে। ভীত ব্যক্তির চিন্তা যেখানে আত্মকেন্দ্রিক এবং শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার, সেখানে একজন লজ্জাশীল ব্যক্তির ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর মহত্ত্ব। দুজনেই ঈমানের মর্যাদায় সমাসীন। তবে লজ্জাশীল ব্যক্তি লাভ করবে ঈমানের উচ্চ স্তর-ইহসানের গৌরব। ইহসান হলো সজাগ অনুভূতি নিয়ে সবসময় এমনভাবে আচরণ করা, যেন সে আল্লাহকে দেখছে। ফলে তার হৃদয় আল্লার সম্মানে পূর্ণরূপে লজ্জায় বিনম্র হয়।

মুমিনের জন্য গুনাহ থেকে দূরে থাকা অত্যাবশ্যক। কেননা, তাকে অবশ্যই তার ঈমান রক্ষা করতে হবে, আর গুনাহ ঈমানে ঘাটতি আনে অথবা এটাকে নিঃশেষ করে দেয়। নবিজি বলেন,

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

"যেনাকারী যখন যেনায় লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। মদ্যপ যখন মদ্যপানে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। চোর যখন চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, তখন সে মুমিন থাকে না। আর লুটতরাজ ও ছিনতাইকারী যখন লুটতরাজ ও ছিনতাই করে এবং লোকজন তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, তখন সে মুমিন থাকে না।[২]

পরীক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য:

যে উপায়গুলোর মাধ্যমে আপনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করতে পারেন:

১. অপেক্ষমাণ উত্তম পুরস্কারের কথা চিন্তা করা: আপনার জন্য পুরস্কার অপেক্ষা করছে-এটা যতবেশি বিশ্বাস করতে শিখবেন, ধৈর্যধারণ করাটা আপনার জন্য ততই সহজ হয়ে উঠবে। যদি পুরস্কার লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস না থাকতো, তাহলে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো স্বপ্ন ও লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব হতো না। মানুষের স্বভাব হলো সবকিছুতেই সে নগদ প্রাপ্তি চায়, কিন্তু বিচক্ষণতা ও পরিপক্কতা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী ফলাফল অর্জনে উৎসাহিত করে। চিন্তার এই দূরদর্শিতা সংকট মোকাবিলায় টিকে থাকতে আমাদের ধৈর্যশক্তিকে মজবুত করে, চাই এতে ইচ্ছের দখল থাক বা না থাক।

২. সুদিনের আশা রাখা: এ আশা আমাদের অবিলম্বে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিরসন করে মুক্তির পথ দেখায় ও মনে সান্ত্বনা জোগায়।

৩. আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিআমাত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা: আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপকতা অনুভব করতে পারলে বর্তমানের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে ধৈর্যধারণ আমাদের জন্য সহজতর হয়। কারণ, বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের অসীম সাগরের তুলনায় একটি বৃষ্টিবিন্দু সমতুল্য।

৪. আল্লাহ আগে যে সমস্ত নিআমাত দিয়েছেন সেসবের কথা চিন্তা করা এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর মমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সুদিনের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ় করে।

সুখের চেয়ে দুঃখের সময় ধৈর্য্য ধারণ সহজ:

একজন সালাফ বলেন, "মুমিন ও কাফির উভয়েই বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে, কিন্তু সুস্থতা বা নিরাপত্তার সময় ধৈর্যধারণ করতে পারে একমাত্র সাদিকীনরা।" আব্দুর রহমান বিন আওফ বলেছেন, "আমাদের যখন দুর্ভাগ্য দ্বারা পরীক্ষা করা হলো, তখন আমরা সবর করলাম। কিন্তু যখন সুখ-সমৃদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করা হলো, তখন সবর করতে ব্যর্থ হলাম।"

আল্লাহ সন্তান, সম্পদ ও স্ত্রীর ফিতনা থেকে সতর্ক করে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদের সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়। "

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের স্ত্রী আর সন্তানদের মধ্যে কতক তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা তাদের হতে সতর্ক হও।"

যে শত্রুতা ঘৃণা ও সংঘর্ষ থেকে সৃষ্ট, আয়াতটিতে সে রকম শত্রুতার কথা বলা হয়নি। বরং এখানে স্নেহ-মমতার কথা বলা হয়েছে, যা অনকে সময় বাবা-মা'কে বিরত রাখে হিজরত, জিহাদ, জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং দান-সাদাকার মতো দ্বীনী কাজগুলো থেকে।

ইমাম তিরমিযি ইবনু আব্বাস এ থেকে বর্ণনা করেন:

"একবার এক ব্যক্তি তাঁকে উল্লিখিত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। ইবনু আব্বাস এই তাকে বলেন, মক্কার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু যখন তারা নবিজি -এর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মদিনায় হিজরত করতে চায়, তখন তাদের স্ত্রী ও সন্তানরা তাতে বাধা দেয়। পরবর্তী সময়ে, তারা যখন মদীনায় হিজরত করে দেখল অন্যরা ইতিমধ্যে দ্বীনের তাফাকুহ (গভীর জ্ঞান) অর্জন করে ফেলেছে তখন তারা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের শাস্তি দিতে চাইল। এ সময় আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন: "তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ।“। (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৪)

إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ

"নিশ্চয় সন্তান কার্পণ্য ও কাপুরুষতার কারণ"।

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় স্ত্রী ও সন্তান, মানুষের সাফল্য ও পূর্ণতার পথে কত বড় প্রতিবন্ধক। একদিন নবি খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন হাসান ও হুসাইন সেখানে লাল জামা পরিহিত অবস্থায় আসলেন। তাঁরা হোঁচট খেতে খেতে হাঁটছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ মিম্বার থেকে নেমে এসে তাদের কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সামনে এনে রাখলেন। অতঃপর বললেন, "মহান আল্লাহ সত্য আল্লাহ বলেছেন:

أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য ফিতনা। "[0]

আমি এই দুটো বাচ্চাকে হোঁচট খেতে খেতে হাঁটতে দেখে আর ধৈর্য ধরতে পারিনি, এমনকি আমি আমার কথা বন্ধ করে তাদের উঠিয়ে নিয়েছি।" রাসূল এমনটা করেছেন কারণ, তিনি শিশুদের ভালোবাসতেন এবং উম্মাহর জন্য শিশুদের প্রতি দয়া ও কোমলতার নজির সৃষ্টি করলেন।

সুসময়ে ধৈর্যধারণ অধিকতর কঠিন। কারণ, তখন আমরা কেমন আচরণ করব তার অনেকগুলো বিকল্প থাকে। কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তির যখন ক্ষুধা মেটানোর খাবার না থাকে তার জন্য ধৈর্যধারণ করা তুলনামূলক সহজ; কারণ, তার ধৈর্য ধরা ছাড়া তো তার কোনো উপায় নেই। কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে তার ধৈর্যশক্তি নিস্তেজ হতে থাকে (কারণ,

এখন তার বিকল্প আছে)। একইভাবে যেখানে নারীর উপস্থিতি নেই, সেখানে যৌন সংযম অধিকতর সহজ।

সর্বাধিক কষ্টসাধ্য ধৈর্য্য:

কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা কতটা কঠিন, তা নির্ভর করে কাজটি করার সক্ষমতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার ওপর। যার খুন, চুরি, মদ্যপান জাতীয় অপরাধ করার ইচ্ছেও নেই, শক্তিও নেই, তার জন্য ধৈর্য ধরাটা সহজ। কিন্তু যার এ ধরনের পাপ করার কুমতলবের সাথে সাথে সামর্থ্যও আছে, তার পক্ষে প্রকৃতই ধৈর্য ধরাটা সত্যিই কঠিন। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কঠিন হলো, অন্যায় ও অত্যাচার থেকে হাত গুটিয়ে রাখা। একজন যুবকের পক্ষে কঠিন হলো ব্যভিচার থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখা। একইভাবে কোনো বিত্তবানের জন্য শারীরিক ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখাটাও কঠিন।
নবিজি বলেন:

عجب ربك من شاب ليست له صبوة

"তোমার রব এমন বালককে দেখে বিস্মিত হন, যার মাঝে বালকসুলভ আচরণ নেই।"

অন্য এক হাদীসে নবিজি যথার্থ ধৈর্যধারণকারীদের আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। এ ধরনের সহিষ্ণু ব্যক্তির উদাহরণ হলো ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও সব অবস্থায় ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেয়। সেই যুবক, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করে এবং সে ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে। আর সে, যেকোনো সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মেয়ের প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে ধৈর্যধারণ করে এবং যে দু-ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মিলিত হয়, তারই সন্তুষ্টির জন্য আলাদা হয়। সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং তা গোপন রাখে, অন্যদের তা বলে বেড়ায় না। সুতরাং একজন বৃদ্ধ ব্যভিচারীর, মিথ্যাবাদী শাসক, বিষম অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তির শাস্তি অধিক হবে। কারণ, এ ধরনের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য অধিকতর সহজ এবং এ জন্য প্রয়োজন স্বল্প ধৈর্যের। অথচ তাদের হাবভাব থেকে বোঝা যায়, তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য:

প্রিয়জনের মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনা, অসুস্থতা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি-এমন বিভিন্ন মানবিক প্রতিকূলতা মোটামুটি দু-রকমের:

১. নিয়ন্ত্রণাতীত দুর্দশা:
ঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এ-জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেগুলোর পেছনে মানুষের কোনো হাত নেই।

২. আরোপিত দুর্দশা:
অন্যদের হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট আপদ। যেমন: অপবাদ, নির্যাতন, বঞ্চনা ইত্যাদি।

নিয়ন্ত্রণাতীত দুর্দশায় আমাদের প্রতিক্রিয়ার ধরনগুলো যেরূপ হতে পারে:

১. অসহায়ত্ববোধ, অসন্তোষ, আতঙ্ক এবং অভিযোগ।

২. ধৈর্য প্রদর্শন-তা হতে পারে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কিংবা মানবীয় গুণ হিসেবে।

৩. স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া এবং এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা। প্রকৃতপক্ষে এটা ধৈর্য থেকেও উচ্চতর অবস্থা।

৪. খুশিমনে ও কৃতজ্ঞচিত্তে পরিস্থিতি গ্রহণ করা। এটা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়ার চেয়েও সমুন্নত অবস্থা; কারণ, এ ক্ষেত্রে সংকটকে অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই পরিস্থিতে নিপতিত হওয়ার জন্য আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

অন্যদের আরোপিত দুর্দশায় আমাদের প্রতিক্রিয়ার ধরনগুলো কীরূপ হতে পারে:

১. ভুলে যাওয়া এবং ক্ষমা করে দেওয়ার ইচ্ছে করা।

২. প্রতিশোধ না নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. তাকদীরের লিখন হিসেবে মেনে নেওয়া। যখন এটা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি এই ক্ষতিটা করেছে সে জালিম হলেও, যে মহান সত্ত্বা এই তাকদির লিখেছিলেন তিনি তো জালিম নন। এ রকমের ক্ষতির শিকার হওয়া অনেকটা গরম বা শীতে কষ্ট পোহানোর মতো। এই আপদের সংঘটনকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, আর গরম ও শীতকে অভিযোগ দেওয়া তো প্রলাপের নামান্তর। যা-কিছু ঘটে তাকদীর অনুযায়ী ঘটে, যদিও তা ঘটার বহু পথ ও উপায় থাকে।

বালা মুসিবতে ধৈর্য্য ধারণ:

বিপদ-আপদে পড়ে অনেকে আল্লাহতায়ালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। কিন্তু এটা মোটেও উচিত নয়। আল্লাহতায়ালা যাকে যত বেশি ভালোবাসেন তাকে তত বেশি বালা-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। এজন্য নবী-রাসুলদের জীবনী পড়লে আমরা দেখতে পাই তারা সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এজন্য আল্লাহতায়ালার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র কোনো অভিযোগ ছিল না। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তারা একনিষ্ঠভাবে দীন প্রচারের কাজ করে গেছেন। বিপদ-আপদে যারা আল্লাহতায়ালার ওপর রাজি-খুশি থাকে তিনি তাদের ওপর সন্তুষ্ট হন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে বিপদ-আপদে পড়ে যারা আল্লাহতায়ালার ওপর অসন্তুষ্ট হন তিনিও তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। সাধারণত গোনাহগারদের ওপর দুনিয়াতে কোনো শাস্তি নাজিল হয় না। তখন অনেকে ধোঁকায় পড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ের রহস্য সুস্পষ্ট ভাষায় হাদিসে বর্ণনা করেছেন। হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহতায়ালা যখন তার কোনো বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়াতেই তাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তার কোনো বান্দার অকল্যাণ্যের ইচ্ছা করেন তখন তার গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে শাস্তি দেন না। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে পরিপূর্ণ শাস্তি প্রদান করবেন।’ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, ‘অধিক পুরস্কার অধিক কষ্টের ফল। আল্লাহতায়ালা যখন কোনো কওমকে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি।’ (মুসলিম, হাদিস নং-২৩৯৬, ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৪০৩১)

আল্লাহতায়ালা মানুষকে বিভিন্ন বিপদ-আপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা ধৈর্য ধারণ করে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তাদের জন্য আল্লাহতায়ালার পক্ষ হতে সুসংবাদ রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে এবং তোমাদের জান, মাল ও ফসলের ক্ষতি সাধন করে পরীক্ষা করব। আর আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দান করুন।' (সুরা বাকারা, আয়াত-১৫৫)

মুমিন ব্যক্তি যে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করলে এর বিনিময়ে আল্লাহতায়ালা তার গোনাহ মাফ করে দেন। হজরত আবু সাঈদ ও হজরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন মুসলমানের যে কোনো ক্লান্তি, রোগ-ব্যাধি, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, দুঃখ-কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকী কোনো কাঁটা ফুটলেও এর কারণে মহান আল্লাহ তার পাপসমূহ মাফ করে দেন। (বুখারি, হাদিস নং-৫৬৪২, মুসলিম, হাদিস নং- ২৫৭৩) সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,'মোমিন বান্দার ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক। তার সব কাজই কল্যাণময়। তার আনন্দজনক কিছু হলে সে আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করে, তাতে তার কল্যাণ সাধিত হয়। আর তার দুঃখজনক কিছু হলে সে ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।' (মুসলিম, হাদিস নং-২৯৯৯, আহমদ, হাদিস নং- ১৯৪৬০)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল তারা কোনো বিপদ-আপদে কখনো ধৈর্যহারা হতেন না, বরং ধৈর্যধারণ করে এবং নামাজ পড়ে আল্লাহতায়ালার কাছে সাহায্য কামনা করতেন। তারা সর্বদা আল্লাহতায়ালার এ হুকুম মেনে চলতেন- "তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।' (সুরা বাকারা, আয়াত নং- ১৫৩)

শুধুমাত্র বিপদ-আপদেই যে ধৈর্যধারণের প্রয়োজন তা নয়, বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন সেগুলো পালন করা এবং যেসব কাজ হতে নিষেধ করেছেন সেগুলো হতে বিরত থাকতেও ধৈর্যের প্রয়োজন। কেননা, এতে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যা ধৈর্যশীলদের পক্ষেই সম্ভব। দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়, রমজানে একমাস রোজা রাখা, ধনীদের জন্য বছরে একবার যাকাত দেওয়া ও জীবনে একবার হজ পালন করা, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, পর্দা করা, ন্যায়ের পথে চলা ইত্যাদি আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তার জন্য ধৈর্য আবশ্যক। এছাড়া সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার-ধর্ষণ, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-দুর্নীতি, ছিনতাই-রাহাজানি ইত্যাদি জঘন্য পাপকাজ থেকে বাঁচার জন্যও ধৈর্য আবশ্যক। এজন্য

ওলামায়ে কিরাম ধৈর্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক. বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ। দুই. আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ। তিন. গোনাহর কাজ হতে ধৈর্যধারণ।

ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহতায়ালা অগণিত পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। (সুরা যুমার, আয়াত-১০)। যারা ধৈর্যের সাথে আল্লাহতায়ালার হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে মেনে চলে, এর প্রতিদানে আল্লাহতায়ালা জান্নাতে তাদেরকে বাসগৃহ দান করবেন এবং তারা সেখানে মহাসম্মানের সাথে চিরকাল বসবাস করবে। আল্লাহতায়ালা বলেন,'তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে তাদেরকে জান্নাতে বাসগৃহ দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদেরকে সালাম ও অভিবাদন জানানো হবে। সেখানে তার চিরকাল থাকবে| অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কতোই না উত্তম!' (সুরা ফুরকান, আয়াত-৭৫, ৭৬)

বালা-মুসিবত ; ইমানের পরীক্ষা :-

শুধু মুখে কালেমা পড়ে একজন মানুষ ঈমানের উচ্চ মর্যাদা পৌছা কোনোভাবেই সম্ভব নয়; বরং যে ঈমানের দাবি করে, তাকে অবশ্যই ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এ কথা সমর্থনে আল্লাহ তাআলা একাধিক আয়াতে ঘোষণা করেন-

- আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু সম্পদ এবং জীবনের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।' (সুরা বাকারা : আয়াত ১৫৫)

- আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই যে, কারা জিহাদকারী আর ধৈর্যশীল।' (সুরা মুহাম্মদ : আয়াত ৩১)

যারা এ সব পরীক্ষায় আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে; আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারাই হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সফলকাম।

পরীক্ষা নেয়ার কারণআল্লাহ তাআলা বান্দার থেকে এভাবে পরীক্ষা নেয়ার করণও কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

‘যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের (আল্লাহর বিধান পালনে) দিক থেকে উত্তম।’ (সুরা মুলক : আয়াত ২)

সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই, দুনিয়ায় মুমিন বান্দার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে চরম বিপদ ও মুসিবত দুনিয়া ও পরকালের কামিয়াবি লাভে বিরাট নেয়ামত ও পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় মুমিন বান্দা ধৈর্য ধারণ করেন নাকি অধৈর্য হয়ে যান তা যাচাই করাই এ পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য।

দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ ও মুসিবতে আল্লাহর দরবারে ধরণা দিতেও শিখিয়েছেন প্রিয়নবি। হাদিসে এসেছে-‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কোনো মুসলিম ভাই মুসিবতে আক্রান্ত হয়; তারপর আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বলে-

اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ – اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَ اَخْلِفْ لِیْ خَیْرًا مِنْهَا

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়া আখলিফলি খাইরাম মিনহা।’

অর্থ : ‘আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার মুসিবতে সাওয়াব দান কর, আর আমার জন্য এর চেয়ে উত্তম বদলা দাও!।’তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে আগের তুলনায় উত্তম প্রতিদান এবং বদলা দান করবেন।’

অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন বান্দাকে আরো শিখিয়েছেন যে, যখন সে কোনো বিপদগ্রস্ত লোককে দেখবে, তখন এ দোয়া করবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ – وَ فَضَّلَنِیْ عَلَی كَثِیْرٍ مِّمَنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আফানি মিম্মানিবতালাকা বিহি; ওয়া ফাদ্দালানি আলা কাছিরিম মিম্মান খালাকা তাফদিলা।’অর্থ : সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে বিপদাক্রান্ত করেছেন; তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তিনি তার মাখলুক

থেকে মাখলুকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তখন তাকে এ মুসিবত কখনো স্পর্শ করবে না।' (তিরমিজি)

ইমানদার ব্যাক্তির পুরস্কারস্বরূপ;বালা-মুসিবত:

মনে রাখতে হবেদুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা তার মুমিন বান্দাকে যে বিপদ ও মুসিবদ দেন, তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে হয় না, বরং কোনো অন্যায়কে প্রতিহত করা অথবা তার গোনাহগুলো ক্ষমা করা অথবা সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য হয়। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন-

'কোনো মুসলিম যখন কোনো কষ্টের মুখোমুখি হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার গোনাহগুলো এমনভাবে ঝেড়ে ফেলে দেন, যেমন গাছের পাতাগুলো ঝরে যায়।' (বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং মুমিন বান্দার জন্য তাদের অসুস্থতা, পেরেশানি, দুশ্চিন্তা এ সবই বিরাট সুসংবাদ এবং নেয়ামত। এ সব বিপদ আপদেও তারা কখনো আল্লাহর আনুগত্য থেকে পৃথক হয় না। কেননা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে পরীক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছেন কুরআনে। তিনি বলেন-

- 'আর আমি ভালো-মন্দ দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।' (সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৩৫)

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে বালা-মুসিবত, নেয়ামত, কষ্ট, সুখ, রোগ, সুস্থতা, ধন-সম্পদ ও অভাব, হালাল-হারাম, আনুগত্য-নাফরমানি এবং হেদায়েত ও গোমরাহিসহ বিভিন্নভাবে ঈমানের উচ্চ মর্যাদার পরীক্ষা নিয়ে থাকেন।

বিপদ যখন নিয়ামাত

কোনো মুসলিম যখন বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর নিকট নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, তখন সেই বিপদ তার জন্যে নেকির এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কারণ হয়। আর যদি সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, অধৈর্য হয়ে যায়, তখন তা তার জন্য আল্লাহর গজব এবং শাস্তি নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ বলেন,

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله - تعالى - إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط

এ বিপদ যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ কোনো জাতিকে ভালোবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান; আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান। এস

তা হলে বিপদ কি নিয়ামাত নাকি শাস্তি? আমরা বলব, এটি নির্ভর করে আল্লাহর বান্দার আমলের ওপর। যদি সে বিপদকে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের একটি সুযোগ হিসেবে নেয় এবং সে সুযোগ কাজে লাগায়, তা হলে বিপদ তার জন্যে নিয়ামাত। নতুবা, বিপদ তার জন্যে শাস্তি। কষ্ট-যাতনা সত্ত্বেও বিপদ-আপদ মুমিনদের জন্য কিছু উপকার নিয়ে আসে। কষ্ট-যাতনাকে সহজভাবে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে একজন মুসলমান ধৈর্য ও সহনশীলতার মহৎ গুণ অর্জন করতে পারে।

• কষ্ট মুমিনদেরকে ধৈর্যশীল হতে শেখায়। আল্লাহ তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের অজস্র পুরস্কার দান করেন

• দুঃখ-দুর্দশা গুনাহগার মুসলিমদেরকে জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়-মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে যে-কোনো সময় মারা যেতে পারে। আল্লাহর নাফরমানি করতে করতে মারা গেলে তাকে যে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, সেই বোধোদয় ঘটে তার।

• যখন কেউ আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়, সে কারও উপদেশকে তেমন পাত্তা দেয় না। কিন্তু বিপদের সময় তার আল্লাহকে মনে পড়ে, পরকালের ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ হয়। আল্লাহ বলেন,

(تنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

(বড় শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। "১)

তাই বিপদে পড়লে মানুষ নিজের গুনাহ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণের অবকাশ পায়। ফলস্বরূপ, সে নিজের ভুলগুলো উপলব্ধি করতে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারে। এভাবে, দুনিয়াবি বিপ একজন গুনাহগার বান্দার জন্যে নিয়ামাত হিসেবে আসে। গুনাহের মুমিনদেরকে পরকালে যে অসহনীয় ও অসহ্য শাস্তির যন্ত্রণা ভোগ করে দুনিয়াবি বিপদ-আপদের কারণে সেই গুনাহের বোঝা হালকা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ বলেন,
(تنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

বড় শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে " তারা প্রত্যাবর্তন করে। "১৯

তাই বিপদে পড়লে মানুষ নিজের গুনাহ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণের অবকাশ পায়। ফলস্বরূপ, সে নিজের ভুলগুলো উপলব্ধি করতে পারে। তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারে। এভাবে, দুনিয়াবি বিপদ-আপদ একজন গুনাহগার বান্দার জন্যে নিয়ামাত হিসেবে আসে। গুনাহের কারণে মুমিনদেরকে পরকালে যে অসহনীয় ও অসহ্য শাস্তির যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, দুনিয়াবি বিপদ-আপদের কারণে সেই গুনাহের বোঝা হালকা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ বলেন,

মুসলিম নর-নারীর ওপর ক্রমাগত বিপদ আসতেই থাকে, যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণ গুনাহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। রাসূলুল্লাহ আরও বলেন,

ما يصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غيم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه

• মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে-সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।
পরকালের অসহ্য কঠিন শাস্তির তুলনায় দুনিয়াবি কষ্ট-যন্ত্রণাগুলো তো কিছুই না।

দুনিয়াবি কষ্টগুলো তো মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পরকালের শাস্তিগুলো তো চিরস্থায়ী। পরস্ক, আল্লাহ তো আমাদের অধিকাংশ অবাধ্যতাগুলো দুনিয়াতেই ক্ষমা করে দেন। আমরা দুনিয়াতে যেসব কষ্ট ভোগ করি, তা তো আমাদের গুনাহের ক্ষুদ্র একটি অংশেরই প্রতিফল। দয়াময় আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

“ তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন। "স

আমাদের প্রত্যেকটি গুনাহের কারণে আমাদেরকে যদি শাস্তি দেওয়া হতো, তা হলে সমগ্র পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا *

১৬ যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করবেন), আল্লাহ তাআলা বান্দাদের যাবতীয় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।"

বিপদ কামনা করা অনুচিত

দুনিয়াবি বিপদ-আপদের নানা উপকারিতা, পুরস্কার এবং এর বিনিময়ে পরকালের শাস্তি মাফের মহা-সুযোগ দেখে অনেকের কাছে মনে হতে পারে, দুনিয়াবি বিপদ ভোগ-করা এবং আল্লাহ যাতে বিপদে ফেলেন এমন প্রার্থনা করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু মুসলিমদেরকে বিপদ চেয়ে দুআ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ:

প্রথমত, বিপদসংকুল অবস্থায় যে-কোনো ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাত অস্বীকার করতে পারে, হয়ে যেতে পারে অবিশ্বাসী। আর তা ছাড়া নিজের গুনাহের সম্পূর্ণ ভার এই দুনিয়াবি জীবনে বহন করা আমাদের কারও পক্ষেই সম্ভবপর হবে না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের বিশেষত্বই হচ্ছে ইসলাম সহজ এবং ক্ষমার ধর্ম। নিজের বিপদ চেয়ে প্রার্থনা করা তাই ইসলামের এই বিশেষত্বের সাথেই সাংঘর্ষিক। আমাদেরকে তো

এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নিজেদের কল্যাণ এবং গুনাহ মাফের জন্য দুআ করি। মহিমান্বিত আল্লাহ কুরআনে আমাদের এই দুআটি শিখিয়ে দিয়েছেন:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ

(مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে " আমাদেরকে অপরাধী কোরো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ কোরো না- যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের ওপর ওই বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো। আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্য করো। "ম

তাই মুসলিমদের উচিত আল্লাহর দয়া গ্রহণ করা এবং আল্লাহর কাছে নিজের কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। বিপদ চাওয়া কখনোই উচিত নয়। আনাস বর্ণনা করেন যে, "রাসূলুল্লাহ এটি একবার এক মুসলিমকে দেখতে গেলেন, সে এতই দুর্বল ছিল যে মুরগির বাচ্চার মতো (চিকন) হয়ে গিয়েছিল। রাসূল তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আল্লাহর

কাছে কোনো বিশেষ দুআ করেছ অথবা বিশেষ কিছু চেয়েছ (যার ফলে তুমি এমন হয়ে গেলে)?"

সে জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমি দুআ করেছি যে, হে আল্লাহ! তুমি পরকালে আমার জন্য যেসব শাস্তি রেখেছ, তা আমাকে এই দুনিয়াতেই দিয়ে দাও।" রাসূলুল্লাহ তখন বললেন, "সুবহানাল্লাহ! তুমি তো তা সহ্য করতে পারবে না। বরঞ্চ তোমার কথা বলা উচিত ছিল:

زمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও " কল্যাণ দান করো এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। তারপর তিনি আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির সুস্থতার জন্য দুয়া করলেন আর আল্লাহ একে সুস্থ করে দিলেন।"

বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়

বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত ও নৈকট্য অর্জন করা যায় এমন কিছু উপায় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

সবর: আরবি শব্দ 'সবর' এর মূল শব্দের অনুবাদ করলে তা বোঝায়, 'কোনো কিছুকে আটকে রাখা কিংবা কোনো কিছু হতে বিরত থাকা অথবা নিবৃত্ত থাকা।' ইসলামি পরিভাষায় 'সবর' এর অর্থ হচ্ছে, 'হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকা, অভিযোগ করা থেকে জিহ্বাকে নিবৃত্ত রাখা এবং দুঃখ-দুর্দশার সময় মুখে আঘাত করা কিংবা শরীরের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা থেকে নিজের হাতকে সংযত রাখা।১৯

সবরের বিশেষ গুণ যাদের আছে তারাই সৌভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ বলেন,
مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ

' সবরের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোনো জিনিস কাউকে দেওয়া হয়নি। ১৯

(১) 'সবর' শব্দের অনুবাদ এক শব্দে করা আসলে অসম্ভব। যদিও সাধারণভাবে এর অনুবাদ জ কিন্তু সবর আসলে অেনুবাদ এক শব্দে করা আসলে করো এর ভাবানুবাদ হয় আল্লাহর পথে অটল থাকা বো থাকা। পরীক্ষাতে যের্যের চেয়েও ব্যাপক অর্থ নয়ন করেতিদানের আশায় আল্লাহর আদেশ পালন করে যাওয়া এবং সর্ববিন্ধা যত বড়ই হোক না কেন, দৃঢ়তার সাথে প্রচিয়ে রাখা-সবই সবরের অন্তর্ভুক্ত।

মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, যারা সবর করে তাদেরকে অজস্র সওয়াব দান করা হবে। তাদের প্রতিদান এত বেশি পরিমাণ হবে যে, তা না মাপা যাবে আর না গণনা করা যাবে। আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

.

" নিশ্চয় সবরকারীদেরকে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে পরিপূর্ণরূপে এবং (তা হবে) অগণিত। উত্তমরূপে সবর এনে দেবে প্রতিশ্রুত প্রতিদান, যার ওয়াদা আল্লাহ করেছেন।
আর তা অর্জন করতে হলে বিপদের শুরু থেকে সবরের অনুশীলন করতে হবে। যখন সর্বপ্রথম বিপদের ব্যাপারটি আপনি আঁচ করতে পারবেন, ঠিক তখন থেকেই সবরের অনুশীলন করতে হবে। বস্তুত, অন্তর তো দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, কিন্তু তবুও আল্লাহর বান্দারা হতাশায় মুষড়ে পড়ে না। তারা সবর করে। আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।

যখন বিপদ আসে তখন মানুষ বিচলিত হয়। একটা সময় পর যখন কষ্ট বি লাঘব হয়, তখন সে সবর করে। কিন্তু এটি প্রকৃত সবর নয়। প্রকৃত সবর তো ক হবে তখন, ঠিক যে মুহূর্তে আপনার ওপর বিপর্যয় আসবে। রাসূলুল্লাহ বলেন,

الصبر عند الصدمة الأولى

এ নিশ্চয় সবর তো (করতে হবে) প্রপ্রশ্ন আঘাতেই।
বাস্তবতা হচ্ছে প্রত্যেককেই সবর করতে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক কিংবা অনিচ্ছায়, একসময় সবাইকেই সবর করতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি তো সে-ই, যে প্রথম থেকেই স্বেচ্ছায় সবর করে, সববের মহান উপকারিতাগুলো বোঝে সবর করে। সে জানে তার সবরের বিনিময়ে সে পুরস্কৃত হবে। আর যদি পেরেশান হয়ে পড়ে তবে সে নিন্দিত হবে। সে জানে, যে সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে গেছে তা আর ফিরে আসবে না। সে জানে, সে আল্লাহর ফায়সালা বদলে ফেলতে পারবে না। বোকা তো সেই ব্যক্তি যে অভিযোগ করে, যন্ত্রণা ভোগ করে। আর যখন তার কোনো উপায় থাকে না, তখন সে সবর করে। তার এই সবরে তো কোনো উপকারই নেই।

• ইহতিসাব: প্রত্যেক দুঃখ-দুর্দশার সময় আল্লাহর নিকট হতে সওয়াবের প্রত্যাশা করাকে ইহতিসাব বলে। যত বেশি কষ্ট-যাতনা হোক না কেন, আল্লাহর নিকট হতে এর বিনিময়ে ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করা হচ্ছে ইহতিসাব।
রাসূলুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মুমিন বান্দার নিকট থেকে যখন তার অতি প্রিয়জনের জান কবজ করা হয়, আর সে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর নিকট তার একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত। "
আসুন আমরা ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়ার কথা স্মরণ করি। আসিয়ার স্বামী ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জালিম বাদশাহ ফিরআউন। এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে আসিয়ার ওপর তার স্বামী ভয়াবহ অত্যাচার করত। এত মারাত্মক জখম আর যন্ত্রণা সহ্য করার পরেও আসিয়া স্বীয় বিশ্বাসে অটল থাকতেন, অসামান্য ধৈর্য আর ইহতিসাব প্রদর্শন করতেন সর্বদা।

তিনি আল্লাহর কাছেই দুআ করলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কী চাইলেন? তিনি চাইলেন আল্লাহ যেন জান্নাতে তাকে একটি প্রাসাদ বানিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা এ অসামান্য ঘটনা কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي
(مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“ আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্যে ফিরআউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল: হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। "

যখন তিনি এই দুআ করলেন, তখন আকাশের দ্বারগুলো উন্মোচিত হয়ে গেল। আর আসিয়া জান্নাতে তার ঘর দেখতে পেলেন। তা দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ফিরআউন আদেশ করল, একটি বড় পাথরখণ্ড এনে তা যেন আসিয়ার ওপর ফেলে আসিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সে পাথরখণ্ড আসিয়ার ওপর নিক্ষিপ্তহওয়ার আগেই আসিয়ার জান কবচ করে ফেলা হলো।

ইহতিসাবের কারণে আল্লাহ আসিয়াকে দুইটি নিযামাত দান করলেন। তাকে জান্নাতে প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন এবং ফিরআউনের দুষ্ট পরিকল্পনা থেকেও হিফাজত করলেন। তাইতো তার পরে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যারাই আসবেন, তাদের সবার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবেন।।।

• ইসতিরজা ইহতিসাব: বিপদের সম্মুখীন হয়েও আল্লাহর প্রভুত্বের ঘোষণা দেওয়া ও আল্লাহর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়াকে ইস্তিরজা বলে। ইস্তিরজা হচ্ছে বিপদসংকুল অবস্থায় 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' বলা; অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।'

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
* إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

১৬ এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়-ক্ষুধা-মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। "
উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) :ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً »

منها » إلا أخلف الله له خيراً منها

' রাসূলুল্লাহ এষ্ট্র বলেন, "যখনই কোনো মুসলিম বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হয় আর এ কথা বলে যে: 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার বিপদের জন্য আমাকে পুরস্কৃত করো আর তা আমার জন্য উত্তম কোনো জিনিস দিয়ে বদলে

দাও'-তা হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং তার (বিপদের) পরিবর্তে তাকে উত্তম জিনিস দান করবেন।"

উম্মু সালামান বলেন, "আর তাই যখন আমার স্বামী আবূ সালামা মারা যান, তখন আল্লাহ আমাকে এই দুআ করার তৌফিক দিলেন। আর তার (আবূ সালামা-র) পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ স্ত্রী-কে দিলেন (অর্থাৎ পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ -এর সাথে উম্মু সালামা-র বিয়ে হয়)।

• শাকওয়াহ: শাকওয়াহ অর্থ অভিযোগ করা, নালিশ জানানো। শাকওয়াহ দুই ধরনের-

ক) প্রথম ধরনের শাকওয়াহ হলো আল্লাহর কাছে নিজের দুঃখ-কষ্ট পেশ করা। এটি সবরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের শাকওয়াহ-র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইয়াকূব বলেছিলেন,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

" আমি তো আমার দুঃখ-বেদনা আল্লাহর নিকটই পেশ করি। "খেখ) আরেক ধরনের শাকওয়াহ হচ্ছে মানুষের নিকট নালিশ করা। এটি হতে পারে প্রত্যক্ষভাবে কথার দ্বারা অথবা পরোক্ষভাবে আচার-আচরণ বা কাজের দ্বারা, যেমন : বিবর্ণ পোশাক পরিধান করা, মাথা মুণ্ডানো, হতাশা প্রকাশ করা ইত্যাদি কাজের দ্বারা। এ-ধরনের শাকওয়াহ হচ্ছে সবরের সাথে সাংঘর্ষিক। এ-ধরনের শাকওয়াহ আল্লাহর ফায়সালার ওপর অসন্তুষ্টি ও অনাস্থা প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমানের দৃঢ়তার অভাব প্রমাণ করে।

তবে নিজের আপনজনকে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানানো দোষের কিছু নয়।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ এ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ -এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর শরীরে আমার হাত বুলালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত।" রাসূলুল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের দু-ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু আক্রান্ত হই।" আমি বললাম, "এটা এ-জন্য যে, আপনার জন্য প্রতিদানও দ্বিগুণ।” রাসূলুল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ!" তারপর রাসূলুল্লাহ বললেন,
ما من مسلم يصيبه أذى؛ مرض فما سواه، إلا حط الله له سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها

' যে-কোনো মুসলিমের ওপর কোনো যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি বা এ ধরনের অন্য কিছু আপতিত হলে, তাতে আল্লাহ তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলে। স

সূতরাং বিপদগ্রস্ত হলে সবর করা, আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখা (ইহতিসাব), আল্লাহর কাছেই বিপদে নিজেকে সঁপে দেওয়া (ইস্তিরজা) এবং আল্লাহর কাছেই নিজের দুঃখ-দুর্দশার নালিশ জানানো। এই চারটি কাজের দ্বারা আমরা বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া অর্জন করতে পারি।

ধৈর্য্য বাড়ানোর উপায়:

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৬)
অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমরা তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

যেভাবে ধৈর্যের চর্চা করব:

এক..
এ কথা বিশ্বাস করা যে সব কিছুর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর।

ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। তাঁর কোনো কাজের ওপর প্রশ্ন করার কারো কোনো অধিকার নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি যা করেন সে বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩)

দুই.
সব বিষয় আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কখন কোন মুসিবত আসবে তা আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে।

অসুস্থতা, দারিদ্র্য, দুঃখ-বেদনা যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছু আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে, এ ধারণা একজন মুমিন সর্বদাই পোষণ করে। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

‘যদি সব উম্মত তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অন্যদিকে যদি সব উম্মত তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার তকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৬)
তিন. এ কথা বিশ্বাস করা, পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে কেউ-ই আপদমুক্ত নয়। ছোট-বড় বিপদাপদে সবাই আক্রান্ত হয়েছে। এ দুনিয়া বিপদের জায়গা। তাই এমন ধারণা পোষণ করা যে আমার কোনো ধরনের বিপদাপদ আসবে না, তা চরম ভুল; বরং এর মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো পরীক্ষার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, আবার গুনাহ মাফ করার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন, বান্দাকে আরো আল্লাহর নৈকট্য করে তোলার জন্য বিপদ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মানুষ কি মনে করেছে যে আমরা ঈমান এনেছি—এ কথা বললে তাদের পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে?’ (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ২-৩)

চার. বান্দা যেন বিপদে পড়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, সে জন্য আল্লাহ বান্দাকে ছোট-বড় বিপদ দিয়ে থাকেন; এই বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা তাদের ওপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৬)

পাঁচ. বান্দার জানা নেই তার জন্য কোনটা কল্যাণকর আর কোনটা অকল্যাণকর। তাই কখনো কখনো বিপদ তার জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘তোমরা যা অপছন্দ করো হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসো, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৬)

ছয়. এ কথা চিন্তা করা যে দুনিয়া কারো স্থায়ী জায়গা নয়; বরং এটি একটি স্টেশনের মতো। তাই ছোট ছোট মসিবতের ওপর যদি ধৈর্য ধারণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর জন্য অনেক বড় বিনিময় দান করবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘দুনিয়া মুমিনের জন্য কয়েদখানা এবং কাফিরের জন্য জান্নাততুল্য।’ (মুসলিম, হাদিস : ৭৩০৭)

সাত. বিপদাপদে এ কথা মনে করা যে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসুল ও তাঁর প্রিয় বান্দাদের নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। আমাকেও পরীক্ষা করে আমাকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই বিপদের সঙ্গে মুক্তি আছে, কষ্টের সঙ্গে আছে স্বস্তি। এ ছাড়া একজন মুমিনের এ কথা বিশ্বাস রাখা চাই যে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে এমন কোনো মসিবত দেন না, যা তার সক্ষমতার বাইরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬)

আট. দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য সুন্দর ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করা। যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দাঁড় করানো। যেমন—কোনো ব্যক্তি আপনাকে রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করেছে। আপনি মনে মনে ভাবলেন, লোকটা মনে হয় এমনিতেই রাগী। তাই আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলেছে। তার স্বভাব এটা। সুন্দরভাবে কারো সঙ্গে কথা বলতে না পারা, এটা এক ধরনের তার অসুস্থতা।

এ ছাড়া যারা ধৈর্যশীলদের সংশ্রবে যায়, তাদের মধ্যে এই গুণ ধীরে ধীরে চলে আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ধৈর্যশীল বান্দা হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মানবজীবনে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা:

যে গুণাবলী মানুষের জীবনকে সফল ও সার্থক করে তোলে তন্মধ্যে সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যশীলতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশেষ গুণটির সামনে অন্যায়-অনাচার মাথানিচু করে।

ফলে সহিষ্ণু ব্যক্তি স্বীয় গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। সহিষ্ণুতা জীবন বিকাশের প্রবল বাধাকে অনুকূলে আনয়ন করে, বিজয়ী ঘোষণা করে সহনশীল মানুষকে

সহিষ্ণুতা বা সবর বলতে বুঝায় সংযম অবলম্বন ও নফসের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। সহ্য করার বৈশিষ্ট্যের নাম সহিষ্ণুতা।

নিজের মনোভাবের সঙ্গে ঐকমত্য সৃষ্টি করে না এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে নিজের ক্ষমতা ও ঔদ্বত্য প্রকাশ না করে নম্রতা ও সৌজন্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করাই ধৈর্যশীলতা।

সহিষ্ণুতা গুণসম্পন্ন মানুষ কখনও বিরোধকে প্রবল করে তোলে না।ধৈর্যধারণকারী মানুষ নিজের সমূহ ক্ষতি স্বীকার করে অন্যকে হাসিমুখে মোকাবিলা করে। নিজের শক্তি-সামর্থ থাকলেও যে অপরের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠে না তার মধ্যে সহিষ্ণুতা গুণ বিদ্যমান

বলে বিবেচনা করা চলে। অপরের ঔদ্ধত্যকে যে ব্যক্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে সে ব্যক্তি যথার্থ ধৈর্যশীল বলে মর্যাদা পায়। এভাবে সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ধৈর্য, ক্ষমা ও মহত্ত্বের পরিচয় মেলে।

পবিত্র কোরআনে কারিম হাদিসের পরিভাষায় সবরের ৩টি শাখা রয়েছে—

এক. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদী থেকে বিরত থাকা,

দুই. ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং

তিন. যেকোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ সে সব বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা করা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবরের পরিপন্থী নয়। -ইবনে কাসির

সবরের উপরোক্ত ৩টি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কোরআন-হাদিসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেরই সবরের অবলম্বন করে।মানব জীবনে সহিষ্ণুতার প্রয়োজনের শেষ নেই। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। সমাজের সকল মানুষ এক রকম নয়। সামাজিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে নানা কারণে বিরোধিতা দেখা দেয়। এই বিরোধ সহজেই প্রবল আকার ধারণ করতে পারে এবং তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। এই ধরনের সংকটজনক পরিস্থিতির ক্ষতিকর পরিণাম থেকে অব্যাহতি লাভের দরকার সহিষ্ণুতার মতো সৎ গুণের। সমাজের মধ্যে নানান ধরনের লোক বসবাস করে। সকলের রুচি ও মনমানসিকতা এক রকম নয়। ফলে পারস্পরিক বিরোধ এবং প্রতিহিংসার সৃষ্টি সাধারণ ব্যাপার। এই পরিস্থিতির কল্যাণকর সমাধানের জন্য সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। মানুষের ব্যক্তিজীবনে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। সেখানে অনেক প্রতিপক্ষ থাকে। তাদের কাছে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে মন জয় করা যায়। মতবিরোধ এড়িয়ে সদিচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে পারলে বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব। সহিষ্ণুতার মহৎ গুণটি এখানে বিশেষ অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক জীবনের মতো রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সহনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে। পরস্পর বিরোধ এড়িয়ে, প্রতিপক্ষকে শত্রু বলে বিবেচনা না করে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজকর্ম চালিয়ে গেলে সেখানে সহিষ্ণুতার নিদর্শন মেলে। সকল কাজের শুভ পরিণতি আনয়নে সহিষ্ণুতা সাহায্য করে। যোগ্যতা দিয়ে মানুষ সমাজে টিকে থাকে। সে যোগ্যতা প্রদর্শন ও তার ফল হাতে না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে হবে। উগ্র প্রতিপক্ষকে শক্তির সাহায্যে পরাভূত করার চেয়ে ধৈর্যধারণ করার মাধ্যমে পরাভূত করা সহজ। জীবনের প্রতিকূল অবস্থায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারলে দুঃখ, কষ্ট ও মনোবেদনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাই জীবনে

সহিষ্ণুতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।জীবনকে সুন্দর, সার্থক ও মহৎ করার জন্য সহিষ্ণুতার ব্যাপক অনুশীলনতা করা দরকার। এর প্রতিদানে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের অনুকূলেই থাকেন। ' –সূরা বাকারা : ১৫৪

পবিত্র কোরআনে আরো ঘোষণা করা হয়েছে, 'সবরকারী বান্দাদেরকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে। ' -সূরা আজ জুমার : ১০

সহিষ্ণু হলে জীবনে যে সাফল্য আসে তার প্রভাব চারপাশের জীবনে সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য সহিষ্ণুতার পথ অনুসরণ করতে হবে। জীবনকে সুন্দর ও সফলকাম করার যে সাধনায় মানুষ নিজেকে সমর্পণ করেছে তা করার জন্য সহিষ্ণুতাকে উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তাহলে জীবন হয়ে উঠবে সার্থক ও সুন্দর।

আল-কুরআনের নির্দেশনায় বালা-মুসিবত ও ধৈর্য :-

যার ধৈর্য আছে, তার সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ আছেন। ধৈর্যের সরাসরি নির্দেশ দিয়ে আল কোরআনে ২৫টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। পাশাপাশি হাদিসের সংখ্যাও নেহায়েত কম না। এ প্রবন্ধে পবিত্র কোরআনে ধৈর্যধারণের ৭টি নির্দেশমূলক আয়াত তুলে ধরা হলো।

শুভ পরিণতির জন্য ধৈর্যধারণ করুন : ধৈর্যশীল ব্যক্তি সব কাজে যখন মহান রবের সিদ্ধান্তের পানে তাকিয়ে থাকেন, তখন আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ধৈর্যের শুভ পরিণতি দান করেন। পবিত্র কোরআনে এসেছে : 'অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন, শুভ পরিণতি তো মুত্তাকিদের জন্য নির্দিষ্ট।' (সুরা হুদ : ৪৯)।

উত্তমভাবে ধৈর্যধারণ করুন : আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিব (সা.)-কে উত্তম ধৈর্যধারণের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে বলেন : 'অতএব আপনি (হে নবী) উত্তম সবর করুন।' (সুরা মাআরিজ : ৫)।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করুন : আল্লাহ কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে মানুষকে যেসব নির্দেশনা প্রদান করেছেন সে বিষয়ে অবিচল থেকে কোন অত্যাচারী কর্তৃক অত্যাচারিত হলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ প্রদান করে বলা

হয়েছে : 'আপনি তো কেবল তাই অনুসরণ করেন, যা ওহির মাধ্যমে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। আর সবর করুন যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা করেন।' (সুরা ইউনুস : ১০৯)।

কর্মফল অক্ষত রাখতে সবর করুন : নির্বোধরা মনে করে যে, শক্তি প্রদর্শন করাই সম্মান বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু মোমিনরা নির্বোধদের এই হীন চিন্তা থেকে বিমুখ থাকেন। কারণ, তারা আল্লাহর এই ঘোষণা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রাখেন : 'আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহ পুণ্যবানদের কর্মফল বিনষ্ট করেন না।' (সুরা হুদ : ১১৫)।

চিন্তামুক্ত থাকতে ধৈর্যশীল হোন : কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি যখন মোমিনকে কটাক্ষ করে কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করে তখন মোমিনরা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীকে রক্ষাকবচ বলে মনে করেন। এরশাদ হয়েছে : 'আপনি (হে নবী) সবর করুন, আপনার এই সবরের তৌফিক তো আল্লাহই দিয়েছেন। তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।' (সুরা আন-নাহল : ১২৭)।

কাপুরুষ না হতে সবর করুন : আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ মান্য করা মোমিনের একান্ত কর্তব্য। মোমিনের আরও কর্তব্য হচ্ছে যে, পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে না। কারণ, বিবাদে লিপ্ত হলে কাপুরুষতা ভর করবে। আল্লাহ বলেন : 'তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' (সুরা আনফাল : ৪৬)।

বিপদাপদে ধৈর্যশীল হোন : লোকমান (আ.) তার পুত্রকে যে ক'টি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তন্মধ্যে ধৈর্যধারণ করা ছিল অন্যতম একটি। পবিত্র কোরআনে সুরা লোকমান নামে পূর্ণাঙ্গ একটি সুরা অবতীর্ণ করে লোকমান হাকিমের সেই উপদেশাবলি আল্লাহ সংরক্ষিত করেছেন। এরশাদ হয়েছে : 'হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয়ই এটি সাহসিকতার কাজ।' (সুরা লোকমান : ১৭)।

হজরত আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে আজকের লেখা সমাপ্তি করব। রাসুল (সা.) বলেছেন : 'এমন সব জিনিস জান্নাতকে পরিবেষ্টন করে আছে, যা মানুষের অপছন্দনীয়। আর জাহান্নামকে ঘিরে আছে এমন সব জিনিস যা আকর্ষণীয়।'

(মুসলিম : ২৮২৩)। আলোচ্য কালামেপাকের নির্দেশনাবলির মাধ্যমে ধৈর্যধারণের যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে, তা আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের পার্থিব জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে পরকালীন অনন্ত সুখী জীবন লাভ করা প্রত্যেকের একান্ত দায়িত্ব।

ধৈর্য সম্পর্কে সুন্নাহার ভাষ্য:-

হাদিস শরিফে আছে, যে ব্যক্তি বিপদে-মুসিবতে দোয়া পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদ দূর করবেন এবং তার যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম জিনিস তাকে দান করবেন। (বুখারি ও মুসলিম)। ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক হজরত আইয়ুব (আ.) ১৮ বছর পর্যন্ত সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পরম সাফল্য লাভ করেছিলেন। নবী হজরত ইউনুস (আ.)কে সামান্য অধৈর্য হওয়ার কারণে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতের আঁধারে উত্তাল সমুদ্রবক্ষে হিংস্র মাছের উদরে যেতে হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)কে উদ্দেশ করে কোরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ফাছবির লিহুকমি রব্বিকা ওয়া লা তাকুন কাছাহিবিল হুত, ইজ নাদা ওয়া হুওয়া মাকজুম।’ অর্থ: অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ করো তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য-সহচরের (ইউনুস আলাইহিস সালাম) ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। (পারা: ২৯, সূরা-৬৮ কলম, আয়াত: ৪৮)।

১. বিপদাপদের সময় ধৈর্য ধরা এবং ইন্না লিল্লাহ পড়া:

উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি: "কোনো মুসলিমের ওপর মুসিবত আসলে যদি সে আল্লাহ যা হুকুম করেছেন তা-অর্থাৎ 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া- ইন্না ইলাইহি রাজিউন' ('আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব')- বলার পর এবং এ দুআ পাঠ করে:

اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأُخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

'হে আল্লাহ, আমাকে আমার মুসীবাতের প্রতিদান দান করুন এবং এর বিনিময়ে এরচেয়ে উত্তম বস্তু দান করুন।'

তবে মহান আল্লাহ তাকে এরচেয়ে উত্তম বস্তু দান করে থাকেন। [১০]

উম্মু সালামাহ্ বলেন, এরপর যখন আবূ সালামাহ্ ইনতিকাল করেন, তখন আমি নিজে নিজে বললাম, "কোন মুসলিম আবূ সালামাহ থেকে উত্তম? তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি হিজরাত করে রাসূলুল্লাহ-এর নিকট পৌঁছেছেন। যাহোক আমি এ দুআগুলো পড়লাম। এরপর মহান আল্লাহ আবু সালামাহ'র বদলে রাসূলুল্লাহ -এর মতো স্বামী দান করেছেন।
উম্মু সালামাহ বলেন, আমার নিকট বিয়ের পয়গাম পৌঁছুনোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ হাত্বিব ইবনু আবূ বাল্জ্লাআহ-কে পাঠালেন। আমি বললাম, "আমার একটা কন্যা আছে আর আমি একটু অভিমানী।" তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, "i A SER بنتها فادعو الله أن يغنيها عنها وادعو الله أن يذهب بالغيرة কাছে দুআ করব, যাতে তিনি তার সুব্যবস্থা করে দেন। আর (উম্মু সালমাহ সম্পর্কে) দুআ করব যেন আল্লাহ তার অভিমান দূর করে দেন।"
অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ-কে বিয়ে করেন।
২. সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারীর জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ: আবূ মূসা আশআরি এ থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ বলেন,

اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدى فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجعك فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد

"যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফেরেশতাদের বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানকে কবয করেছ।' তারা বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তোমরা তার কলিজার টুকরাকে কবয করেছ?' তারা বলে, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'সে সময় আমার বান্দা কী বলেছে?' তারা বলে, 'সে আপনার হামদ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করেছে।' মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি ঘর বানাও, আর তার নাম রাখো, বায়তুল হামদ (প্রশংসা-ভবন)'।"

৩. আঘাতের প্রথম চোটেই ধৈর্যধারণ করতে করা উচিত:

আনাস বললেন, একবার নবি তখন একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবি আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।" একজন নারীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তাকে বললেন :
"أنتي الله واصبرى

তখন সে বলল, "তুমি আমার বিপদ কি উপলব্ধি করবে?"

৯৫. আস-সুনান, তিরমিযি: ১০২১; তাঁর মতে হাসান গারীব; ইমাম ইবন হাজার আসকালানি এ৯-এর মতে সনদ হাসান-ফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ, ৩/২৯৬

যখন রাসূলুল্লাহ চলে গেলেন, তখন তাকে বলা হলো তিনি তো রাসূলুল্লাহ। তখন তাকে মৃত্যুর মতো ভয় পেয়ে বসল। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহর দরজায় এসে হাযির হলো। সে তাঁর দরজায় কোনো দারোয়ান পেল না (তাই সরাসরি ঢুকে গেল)। সে বলল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি।" রাসূলুল্লাহ বললেন, إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَ "সবর তো হয় বিপদ আগমনের প্রথম মুহূর্তে।" অথবা বলেছিলেন, عِنْدَ أَوَّلِ الصَّدْمَةِ "আঘাতের প্রথমেই। "

৪. প্রিয়বস্তু হারানোয় ধৈর্যধারণকারীদের প্রতিদান জান্নাত:

আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ বলেছেন: 'আল্লাহ বলেন,

من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب ، لم أرض له ثوابا دون الجنة

"আমি যে বান্দার কাছ থেকে তার প্রিয় দুটি বস্তু (চোখ) নিয়ে নেওয়ার পর সে সবর করে, তাকে প্রতিদান হিসেবে আমি জান্নাতই দেব।"

৫. স্বেচ্ছায় ধৈর্যধারণকারী মহিলার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ:

আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ্ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, "ইবনু আব্বাস আমাকে বললেন: 'আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না?' আমি বললাম: 'অবশ্যই।' তখন তিনি বললেন: 'এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নবি-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল: আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমি উন্মুক্ত হয়ে যাই। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। নবি বললেন:

' ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله تعالى ان يعافيكতুমি যদি চাও, তো ধৈর্যধারণ করতে পারো-তোমার জন্য আছে জান্নাত। আবার

(আস-সহীহ, মুসলিম: ৯২৬ (১৫) ১৭. আস-সুনান, তিরমিযি: ২৪০১; তাঁর মতে হাসান সহীহ; আস-সহীহ, ইবন হিববান: ২৯৩০)

তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করি, যেন তোমাকে সুস্থ করেন।'

স্ত্রীলোকটি বলল: 'আমি ধৈর্যধারণ করব।' সে আরও বলল: 'ওই অবস্থায় আমি উন্মুক্ত হয়ে যাই। তাই দুআ করুন, যেন আমি উন্মুক্ত না হই।' নবি তার জন্য দুআ করলেন। "১৮)

৬. কঠিন পরিস্থিতিতেও ধৈর্যশীলতা আম্বিয়া কেরামদের বৈশিষ্ট্য:

আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, নবি একবার কিছু সম্পদ বণ্টন করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এ তো এমন ধরনের বণ্টন, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়নি। অতঃপর আমি নবি-কে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, তিনি বলেন, নবি একবার কিছু সম্পদ এ তো এমন ধরনের বণ্টন, যা আল্লাহর স আমি নবি-কে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন,

رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر

"আল্লাহ মূসা -এর প্রতি রহম করুন, তাঁকে এরচেয়ে অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"[১৯]

৭. একটি কাঁটা বিদ্ধ হলেও তার বিনিময়ে ধৈর্যশীল ব্যক্তির পাপ মোচন করা হয়:

আবূ সাঈদ খুদরি ও আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবি বলেছেন:

قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه

"মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফোটে-এ সবকিছুর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।" [১০০]

৮. কাঁটার চেয়ে নগণ্য আঘাতের বিনিময়েও ধৈর্যশীলের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়: আয়িশা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন:

من مصيبة تصيب المسلم الا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها

"মুসলিম যে বিপদেই আক্রান্ত হোক, এর দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ মোচন ক এমনকি তা যদি একটা কাঁটাও বিঁধে তবুও।"[১০০১।

৯. কষ্ট বা রোগ-ব্যাধিতে ধৈর্য ধারণকারীর গুনাহগুলো ঝরে যায়:

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম এবং বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত।" রাসূলুল্লাহ বললেন, " أجل انى لأوعك كما يوعك رجلان منكم হ্যাঁ, আমি এমন কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হই, যা তোমাদের দুজনের হয়ে থাকে।" আমি বললাম "এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য বিনিময়ও দ্বিগুণ।" রাসূলুল্লাহ বললেন, " نعم والذي نفسي بيده ما على 2011" ،و آله فما سواه الا حط الله عنه به خطايا AR الارض مسلم يصيبه أذى من مرض كما تحط الشجرة ورقها তাঁর কসম, দুনিয়ায় যে-কোনো মুসলিমের ওপর রোগ-ব্যাধির কষ্ট বা অনুরূপ কিছু আপতিত হলে আল্লাহ তাঁর গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়। "

১০. দুঃখে-কষ্টে নবিজি ছিলেন সর্বাধিক ধৈর্যশীল মানুষ:

আয়িশা বলেন,

ما رأيت الوجع اشد منه على رسول الله

আমি রাসূলুল্লাহ-এর চেয়ে বেশি রোগযন্ত্রণা ভোগকারী অন্য কাউকে দেখিনি।

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা : ফযীলত ও পদ্ধতি

হাদীসের বাণী সূর্যালোকের ন্যায় পরিষ্কার, আল্লাহ তাআলার যিকির আর তাঁর সুন্দর ইবাদতের মতো তাঁর শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায়ও আমাদের ইসলামে এক পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়।

আল্লাহবিশ্বাসী প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তিই মনে করে, ভালো-মন্দ সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা সুখ-দুঃখ সবকিছুর তিনিই মালিক। তাঁর ইচ্ছাতেই পথের ফকির কখনো বড় অট্টালিকার মালিক হয়ে যায়, আর কাড়ি কাড়ি সম্পদের মালিকও সবকিছু হারিয়ে পথে নেমে আসে। মুমিনমাত্রই এ বিশ্বাস দৃঢ়তা ও আস্থার সঙ্গে হৃদয়ে লালন করে। এ বিশ্বাসে ভর করেই বিপদাক্রান্ত মুমিন 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলে সান্ত্বনা পায়। আবার কোনো নিআমত পেলে এ বিশ্বাসেই সে উচ্চারণ করে- শোকর আলহামদু লিল্লাহ কিংবা এসবই আল্লাহর দান।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, তোমার পরবর্তীতে আমি এক উম্মত পাঠাব, কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয় যদি তাদের হাসিল হয় তাহলে তারা আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং শুকরিয়া আদায় করবে, আর যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছু তাদের পেয়ে বসে তাহলে তারা সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৫৪৫; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১২৮৯; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৪১৬৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৬৭০৪ আল্লাহ তাআলার নিআমতের কৃতজ্ঞতা আদায়ে নফল রোযা-নামাযের কথাও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সোমবারে রোযা রাখতেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

এটা এমন দিন, যাতে আমার জন্ম হয়েছিল আর এ দিনেই আমার কাছে ওহী আসার সূচনা হয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

আর রাত জেগে জেগে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়তে গিয়ে কখনো তাঁর পা ফুলে যেত। হযরত আয়েশা রা. একদিন তাই জানতে চাইলেন- আপনি এত কষ্ট করেন কেন, আল্লাহ কি আপনার আগে-পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেননি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন,

أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا

আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাই না? -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭

এ কৃতজ্ঞতা মুমিনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। পরকালীন সমৃদ্ধির পাশাপাশি দুনিয়ার জীবনেও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরও অধিক পরিমাণ নিআমত লাভের মাধ্যম এ কৃতজ্ঞতা। আর আখেরাতের অসীম পুরস্কারের ঘোষণা তো আছেই। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস উদ্ধৃত করেই শেষ করছি- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ খেয়ে যে আল্লাহর শোকর আদায় করে সে ধৈর্যশীল রোযাদার ব্যক্তির সমান পুরস্কার লাভ করবে। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭৬৫

পরিশেষে কোরআন ও সুন্নাহার আলোকে বলা যায় যে-যাঁরা উপর্যুক্ত অর্থে ধৈর্য ধারণ করবেন, তাঁদের জীবনে পূর্ণতা ও সফলতা অনস্বীকার্য। কারণ প্রথমত, অন্যায়, অপরাধ তথা পাপকার্য হতে বিরত থাকা সব ধরনের অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। দ্বিতীয়ত, ইবাদত ও সৎকর্ম সম্পাদন করা সফলতার একমাত্র সোপান। তৃতীয়ত, প্রতিকূলতায় দৃঢ়পদ থাকা লক্ষ্যে পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম। 'সবর কামিল' বা পরিপূর্ণ ধৈর্যই মানবজীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে। আমাদের উচিত সব অনভিপ্রেত অবস্থায় যেকোনো অযাচিত পরিবেশ ও অনাহূত পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযত রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া। তবেই আল্লাহর সাহায্য আমাদের সাথি হবে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গী হবেন।

আল্লাহতায়ালা সবাইকে জীবনে সব ধরনের বিপদে ধৈর্য ধারণ করার তওফিক দান করুন। আমিন।

রেফারেন্স:

১. সবর ও শোকর : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রাঃ

২. বিপদ যখন নিয়ামত : শাইখ মূসা জিবরীল

৩.সবর : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযিয়্যাহ রাঃ

৪.প্রথম আলো

৫. দেশ রুপান্তর

৬. নয়া দিগন্ত

৭. বাংলা নিউজ ২৪